ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা

যুদ্ধ-মনস্তত্ত্ব, জেনেভা কনভেনশন ও বাস্তবতা

ডা. শামসুল আরেফীন

সম্পাদনা

মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহমান
মাওলানা মানযুরুল কারীম
মাওলানা ইফতেখার সিফাত
মুহাম্মদ মুশফিকুর রহমান মিনার

ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা :
যুদ্ধ-মনস্তত্ত্ব, জেনেভা কনভেনশন ও বাস্তবতা

ডা. শামসুল আরেফীন

গ্রন্থস্বত্ব © লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২২
ISBN ৯৭৮-৯৮৪-৯৩৩৮৮-৩-৬

প্রচ্ছদ
বুশরা আফজাল

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ ওবায়দুল্লাহ্

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
মাকতাবাতুল আযহার
১২৮, আদর্শনগর, মধ্যবাড্ডা, ঢাকা
maktabatulazhar2@gmail.com

শাখা বিক্রয়কেন্দ্র
দোকান নং ১, আন্ডারগ্রাউন্ড, ইসলামী টাওয়ার,
বাংলাবাজার, ঢাকা

মূল্য
৪৮০ (চারশত আশি) টাকা মাত্র

ISLAME DAS-DASI BYABOSTHA: JUDDHO-MONOSTOTTO,
GENEVA CONVENTION EBONG BASTOBOTA
by Dr. Shamsul Arefin
Published by : MAKTABATUL AZHAR
01924 07 63 65

শারঈ সম্পাদকগণের ভূমিকা

১.

বইটি আমার আদ্যোপান্ত পড়ার সুযোগ হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ্। আমাদের শত্রুরা ইসলামের যেসকল বিষয় নিয়ে অধিক আলোচনা করে, মুসলিমদের ভুল বোঝাতে চায়, তার মধ্যে দাসপ্রথা অন্যতম। বিগত বছরগুলোতে এই বিষয়গুলো নিয়ে অনেক লাইভ আলোচনা হয়েছে, প্রবন্ধ লেখা হয়েছে এবং অনেক বইও বাজারে আছে। কিন্তু তাদের সৃষ্টি করা সংশয়গুলো নিরসনে কুরআন-সুন্নাহ ও সালাফগণের ব্যাখ্যার পাশাপাশি দাসপ্রথার সাথে যুদ্ধনীতি, সমাজনীতির সম্পর্কগুলো কেমন, বিস্তারিতভাবে তা জানা খুবই জরুরি ছিল। আজ ইউরোপের শেখানো ব্যাখ্যা দিয়ে ইসলামকে বোঝার রোগ অনেকের মধ্যে প্রবেশ করেছে। তাই খুবই দরকার ছিল ইসলামের ব্যাখ্যা জানার সাথে ইউরোপের মানবতা ও দাসদের নিয়ে তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হওয়া। নতুবা বর্তমান সময়ে সৃষ্ট বহু প্রশ্ন মনে থেকে যাবে। যার বাস্তবতা আমরা আমাদের সমাজের মানুষদের সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলে বুঝতে পারি।

যারা সালাফগণের ব্যাখ্যার অপব্যাখ্যা করে থাকে এবং ইউরোপের ব্যাখ্যা গ্রহণ করে বলে যে, দাসপ্রথাকে ইসলাম মানসুখ করে দিয়েছে, আমাদের প্রিয় শামসুল আরেফীন শক্তি ভাই এই বইটিতে তাদের বিস্তারিত জবাব দিয়েছেন। বইটি পড়ে আমার যেটা মনে হয়েছে: এই বিষয়ে আরবি, উর্দু ও বাংলায় বেশ কিছু কিতাব পড়েছি। কিন্ত এত সুন্দর করে প্রতিটি কথা দলিল সহকারে গুছিয়ে লিখেছেন, এমন বই বাংলা ভাষায় দ্বিতীয়টি আর নেই। আমার বিশ্বাস: বইটি আমাদের জন্য যেমন জরুরি, তেমনি আমাদের সামনের প্রজন্মের জন্যও বইটি জ্ঞানগত জরুরত পূর্ণ করবে। তাই আমরা না থাকলে যেন আমাদের সন্তানদেরকে তারা ভুল বুঝিয়ে ভুল পথে নিতে না পারে, সেজন্য বাংলাভাষী মানুষের কাছে এই বইটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

মানুষ মাত্রই ভুল করে, কিন্তু মানুষের চেষ্টা অনেক দামী। অনিচ্ছাকৃত থেকে যাওয়া ভুলগুলো সামনে শুধরে নেওয়া হবে, ইন শা আল্লাহ। তবে ইসলামের ব্যাখ্যাগুলো আলেমদের ব্যাখ্যা সামনে রেখে নেওয়া হয়েছে। নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু যুক্ত করা হয়নি।

আল্লাহ ! আমাদের এই মেহনতটুকু তুমি কবুল করে নাও। আমাদের ভুলত্রুটি তুমি মাফ করে দাও। আমিন।

মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান
আলিম | সম্পাদক | শিক্ষক

২.

অমুসলিম কিংবা প্রাচ্যবিদদের পক্ষ থেকে ইসলামের ওপর আঘাত করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিধানকে ফোকাস করা হয়। এরমধ্যে অন্যতম হলো দাসপ্রথা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি। সুপ্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীতে নানাভাবে দাসপ্রথার প্রচলন চলে আসছে। প্রচলিত ছিল দাসপ্রথার বিভিন্ন উৎস। ইসলাম এসে একদিকে দাসপ্রথার একাধিক উৎস বন্ধ করেছে, অন্যদিকে মানবসভ্যতার নির্মম বাস্তবতা যুদ্ধকেন্দ্রিক মনস্তত্ত্বের বিবেচনায় এই প্রথাকে পরিপূর্ণরূপে বিলুপ্তও করেনি। তবে এই একটি উৎস থেকে প্রাপ্ত দাসদেরকে আখিরাতের মুক্তি ও সামাজিক জীবনের সম্মানের দিকে নিয়ে আসার জন্য দিয়েছে নজিরবিহীন পদ্ধতি।

কিন্তু অমুসলিমদের প্রশ্নবাণে আমাদের মধ্যে হীনম্মন্যতার শিকার কিছু মুসলিম এই ক্ষেত্রে প্রান্তিক একটি অবস্থান গ্রহণ করেন। তারা ইসলামকে গুড হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে দাসপ্রথাকেই রহিত করে দেন। যা একদিকে ইসলামের অরহিত এক বিধানকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে, অন্যদিকে হিউম্যান সাইকোলজি ও যুদ্ধবাস্তবতায় দ্বীনে ইসলামের উপযোগিতা ও সফলতাকে অস্বীকার করছে। কারণ যুদ্ধপরবর্তী বাস্তবতায় ইসলামের সম্মানজনক দাস সিস্টেমের কোনো বিকল্প আজ পর্যন্ত কোনো সভ্যতা দিতে পারেনি। এমনকি জেনেভা কনভেনশনগুলোও পরাজিতদের ওপর যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে নেমে আসা বিপর্যয়ের সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারেনি।

মুহতারাম শামসুল আরেফীন শক্তি ভাই বিভিন্ন সভ্যতায় দাসপ্রথার নিষ্ঠুরতা, ইসলামে দাসপ্রথার মহানুভবতা এবং আধুনিক দাসপ্রথার স্বরূপ— এই তিনটি বিষয় বক্ষ্যমাণ বইটিতে মুনশিয়ানার সাথেই তুলে ধরেছেন। দাসপ্রথা নিয়ে অমুসলিমদের জবাবেই ক্ষান্ত থাকেননি, প্রশ্ন করেছেন তাদের সিস্টেম নিয়ে। আঘাত করেছেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থার আধুনিক দাসপ্রথার কাঠামোতে।

আমাকে যদি এই বইয়ের অনন্য কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে বলা হয়, তবে আমি এর তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা তুলে ধরব।

এক. বইটিতে পরাজিত মানসিকতায় প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান গ্রহণের পরিবর্তে ইউরোপীয় দর্শনকে প্রশ্নবাণে আক্রমণ করা হয়েছে।

দুই. শান্তি ও মানবতার দাবিদার পুঁজিবাদী বিশ্বের হর্তাকর্তাদের চাপিয়ে দেওয়া আধুনিক দাসপ্রথার নির্মম অথচ অনিন্দিত (যার নিন্দা করা হচ্ছে না) চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

তিন. মূল বিষয়বস্তুর সাথে কোনোভাবে প্রাসঙ্গিক, এমন বিষয়গুলোর অত্যন্ত তথ্যপূর্ণ আলোচনা এসেছে। উদাহরণস্বরূপ কনসেন্ট বা সম্মতির কথা বলা যায়। কনসেন্টের পশ্চিমা দর্শনের ওপর ভিত্তি করে চলছে যতসব লিবারেল যৌন অসভ্যতা। লেখক অত্যন্ত চমৎকারভাবে কনসেন্টের ধারণার অসম্পূর্ণতা ও ক্ষতিকে তুলে ধরেছেন। এমন আরও অনেক বিষয়েরই আলোচনা এসেছে যা পড়ার সময়ই পাঠক দেখতে পাবেন।

মহান আল্লাহ তাআলা লেখকের চিন্তা ও কলমকে আরও শাণিত করুন। হিদায়াত ও দাওয়াতের পথে ইস্তিকামাহ দান করুন। সর্বোপরি বইসহ এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের মেহনতকে কবুল করে নিন। আমিন।

মাওলানা ইফতেখার সিফাত

আলিম | লেখক | অনুবাদক | সম্পাদক

৩.

যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর। যিনি এক ও অদ্বিতীয়, যাঁর কোনো শরীক নেই। সলাত ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর মহান রাসুল মুহাম্মাদ(ﷺ) এর উপর। যাঁকে আল্লাহ্ সত্য সহকারে প্রেরণ করেছিলেন সুসংবাদ দানকারী ও সতর্ককারী হিসাবে। যাঁর আনিত শরিয়তের সকল অংশের উপর আমরা সন্তুষ্ট ও অনুগত। ।

রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমতাহীন হবার পর থেকে বহুমুখী সংকটের কবলে পড়েছে মুসলিম উম্মাহ। দ্বীন, দুনিয়া উভয় দিক থেকেই নানা সমস্যার নাগপাশ জড়িয়ে ধরেছে। দুনিয়াবী শ্রেষ্ঠত্বের চূড়ায় ধীরে ধিরে আসন লাভ করেছে পশ্চিমা শক্তি। পশ্চিমা উপনিবেশবাদী শক্তি শুধু ভূমির দখলই নেয়নি, মন-মগজেও দখলের ছাপ রেখে গেছে। তারা ভূখণ্ডগুলোর দখল ছেড়ে চলে গেলেও মস্তিষ্কের মাঝে অদৃশ্য সে দখল রয়েই গেছে। নেতৃত্বহীন হীনবল মুসলিম উম্মাহ ঘুরে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে অনেক সময়ে বিশুদ্ধ আকিদা ও সালাফে সলিহীনদের বুঝ থেকে বহু দূরে সরে গেছে। ইসলামের বিভিন্ন দিককে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সালাফদের বুঝ ত্যাগ করে পশ্চিমাদের তৈরি করে দেয়া মানদণ্ডগুলোকেই চূড়ান্ত হিসেবে নিয়েছে। যার ফলে নিজের অজান্তেই শরিয়ার বহু বিধান এমনভাবে ব্যাখ্যা করা শুরু হয়েছে যার সাথে ইসলামের মুবারক যুগের উলামাদের বুঝের কোনো মিল নেই। এই পরাজয় এমন এক পরাজয় যা চোখে দেখা যায় না। ভেতর থেকে উম্মাহকে ধ্বংস করে দেয়।

কোনো কোনো দাঈ হয়তো নেক নিয়তেই ইসলামের বিভিন্ন বিধানকে 'নতুন' ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা চিন্তা করেছেন এভাবে ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। শরিয়া আইনে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি, মৃত্যুদণ্ড, নারী অধিকার, বাল্যবিবাহ, দাস-দাসীর বৈধতাসহ ইসলামের আরো বিভিন্ন দিককে পশ্চিমা সেকুলার-লিবারেল দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন অনেক লেখক ও প্রচারক। এই ব্যাখ্যার ফলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এসব বিধানের অর্থ বিকৃত হয়ে গেছে। অনেক সাধারণ মানুষ এসব ব্যাখ্যা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গেছেন। এমন পরিস্থিতিতে অনেক দাঈ ইসলামের বিভিন্ন বিধি-বিধানকে সালাফে সলিহীনদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার নীতি গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মানদণ্ডের ক্ষেত্রে লিবারেল দার্শনিকদেরকে অনুসরণ করেননি বরং সালাফে সলিহীন এবং মুসলিম উম্মাহর পূর্বযুগের ইমামদের বুঝকেই মানদণ্ড নিয়েছেন। বরাবরই এই দাঈদের প্রতি আমার মন-প্রাণ আকৃষ্ট হয়। তাঁদের মুবারক কর্মের প্রতি অন্তর থেকে সমর্থন থাকে।

ইসলামে দাস-দাসীর বৈধতার বিষয়টি নিয়ে আমরা কয়েকজন দ্বীনি ভাই ২০২০ সালে ফেসবুকে লাইভ আলোচনার আয়োজন করি। সেখানে ইসলামে দাসত্বের বৈধতা, দাসীর সাথে সহবাস, এই বিধি-বিধানগুলোর হিকমাহ নিয়ে কিছু আলোচনার চেষ্টা করি। সাধারণ মানুষের বুঝবার সুবিধার জন্য সহজভাবে কিছু আলোচনা, দলিল ও যুক্তি আনার প্রচেষ্টা ছিল লাইভ প্রোগ্রামগুলোতে। এই বিষয়ে আলোচনাগুলো পুস্তকাকারে নিয়ে আসবার একটা প্রয়োজনীয়তা খুব করে অনুভূত হচ্ছিলো তখন থেকেই। অবশেষে এই গুরুদায়িত্ব পালনে এগিয়ে এলেন প্রিয় লেখক, অগ্রজপ্রতিম ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি ভাই। প্রিয় শক্তি ভাই এরপর থেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ‘ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা’ বইটি রচনা করেছেন। বইটি পাঠ করে অন্তর থেকে প্রশান্তি অনুভব করেছি। এখানে ইসলামকে পশ্চিমের সানগ্লাস থেকে ব্যাখ্যা করার সেই ভ্রান্ত রীতি থেকে বেরিয়ে এসে ইসলামের এই বিধানটির প্রকৃত অবস্থান পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। দলিল ও যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইটি বর্তমান সময়ের পাঠকদের জন্য অত্যন্ত উপকারী হবে বলেই আমার আশা ও বিশ্বাস। আল্লাহ তা’আলাই তাওফিকদাতা।

অনেক সময়ে এই প্রচেষ্টাগুলো ‘প্রগতিশীল’দের তোপের মুখেও পড়ে। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা আমাদের সকলের জন্য জরুরী। ইসলামের বিধানকে কাট-ছাট করে ব্যাখ্যা করা , অস্বীকার বা অপব্যাখ্যা করা এগুলো দ্বারা হয়তো সাময়িকভাবে নাস্তিকদের ‘কুপোকাত’ করার আনন্দ লাভ করা যাবে, এক শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকেও সাময়িক বাহবা পাওয়া যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা’আলা পবিত্র। তিনি পবিত্র ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করেন না। দ্বীন ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে অর্ধসত্য ও অপব্যাখ্যা মূলত মিথ্যার নামান্তর। মিথ্যা দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কখনো অর্জন করা যায় না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দরকার তাঁর দ্বীনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা, কোনো বিধানকে তাহরিফ না করে এর প্রকৃত অর্থগুলো সকলের সামনে তুলে ধরা। এটি মাথায় রেখে দাওয়াহর কাজ করা উচিত। দাওয়াহর ক্ষেত্রে লোকনিন্দা ও সমালোচনার ভয় না করে যারা প্রকৃত সত্য প্রচার করে, তারাই তো দাওয়াহর হক পালন করেছে। এই দিক বিবেচনা করে প্রিয় শামসুল আরেফীন শক্তি ভাইয়ের বইটি সব দিক থেকে আমানত রক্ষা করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি বইটির সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

প্রকৌশলী | গবেষক | অনুবাদক

www.response-to-anti-islam.com

সূচিপত্র

শুরুর আলাপ ১১

ইসলাম ও দাসপ্রথা ১৫

দাসপ্রথা ১৫

এনলাইটেনমেন্ট ১৭

আমেরিকার জাতির পিতারা ২২

কেন ইসলাম দাসপ্রথা রেখেছে? ৩০

কারণটি কি অর্থনীতি? ৩১

আসল কারণ: যুদ্ধনীতি ৩২

ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ৩৫

ইসলামের লক্ষ্য কী? ৩৯

ইসলাম ও যুদ্ধ ৪৬

যুদ্ধের অনিবার্যতা ৪৬

ইসলামের যুদ্ধ-দর্শন ৪৯

ইসলামে যুদ্ধের বিধান ৫১

ইসলামে যুদ্ধ-প্রক্রিয়া ৫৩

দাসপ্রথা বহাল: লক্ষ্য ও উপযোগিতা ৬৪

লক্ষ্য: ইসলামগ্রহণের পরিবেশ দেওয়া ৬৪

উপযোগিতা ১: যুদ্ধ এড়ানো ৭০

উপযোগিতা ২: প্রাণক্ষয় কমানো ৭১

জেনেভা কনভেনশন ১৯২৯ ৭৫

১. যুদ্ধবন্দিদের কাজে নিয়োগ (forced labour) ৭৫

২. যুদ্ধবন্দিদের ভরণপোষণ ৭৮

৩. যুদ্ধবন্দিদের হত্যা ৮৫

জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯ ৮৮
ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৬৮-১৯৭৫) ৮৯
আমেরিকার সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ (২০০১-চলমান) ৯০

যুদ্ধকালীন মনস্তত্ত্ব (WAR PSYCHOLOGY) ৯৮
স্ট্যানফোর্ড প্রিজন এক্সপেরিমেন্ট ৯৮
'রিদম-০' পারফর্মেন্স আর্ট ১০২
পরাজিত সেনার সাইকোলজি ১০৩
বিজয়ীর সাইকোলজি ১০৪
শেষরক্ষা ১০৭

দাসপ্রথার অপকার ১১০
দাসপ্রথাকে আমরা কীভাবে চিনি? ১১১
১. মানুষকে সম্পত্তিতে পরিণত করা ও বেচাবিক্রি করা ১১৬
২. স্বাধীনতা-হরণ ১১৮
৩. নির্যাতন ১২৩
৪. ব্যাপক অসম্মান ১২৫
৫. নিজ বংশ থেকে বিচ্ছিন্নকরণ ১২৮
৬. সাধ্যাতীত শ্রম ১২৯
৭. অপর্যাপ্ত জীবনোপকরণ ১৩০
৮. বর্ণবাদ-গোত্রবাদ ১৩১
৯. ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধা ১৩৫
ইসলামের ইতিহাসে এই নীতির ব্যত্যয় ১৪০
উমার রা. দাসীদের প্রহার করতেন ১৪৫
আরব মুসলিম দাসব্যবসা ১৪৭
জাঞ্জ দাসবিদ্রোহ ১৫০
দাসদের খোজাকরণ ১৫১

দাসমুক্তি ১৫৩
বাধ্যতামূলক দাসমুক্তি ১৫৬
দাসমুক্তি-কে সওয়াবের আমল হিসেবে ঘোষণা ১৫৯

মানবাধিকার ও আধুনিক দাসপ্রথা ১৬৩
পশ্চিমারা তো সম্পূর্ণ বিলোপ করেছে ১৬৫
এরপর কী হলো? ১৭১
নিজ দেশে দাস ১৭৩
আধুনিক দাসপ্রথা ১৭৯
কেন? কে দায়ী? ১৮১

যুদ্ধে নারীর নিয়তি ১৮৯
প্রশ্ন ১. নারীদেরকে কেন বন্দি করা হবে? ১৮৯
যুদ্ধ-কালচার ১৯০
যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধ শেষে নারীর পরিণতি ১৯২
যুদ্ধে গণধর্ষণ ১৯৪
শরণার্থী শিবিরে বাস্তবতা ১৯৯
ইসলামের সমাধান ২০২

দাসীদের সাথে সহবাসের বৈধতা ২০৬
প্রশ্ন ২: সহবাস কেন করা হবে? ২০৭
প্রশ্ন ৩: 'সম্মতি' ছাড়া কেন? ২০৮
তার মানে ইসলাম দাসীকে ধর্ষণ সমর্থন করে? ২১২
যৌনশ্রম ২১৮
ইসলামের দাসীপ্রথায় দাসীরা কেমন ছিল ২২৭
হারেম ২৩১
প্রশ্ন ৪: বিয়ে ছাড়া কেন? ২৩৫
আওতাসের যুদ্ধবন্দি ২৩৭
বনু মুস্তালিকের যুদ্ধ ২৪০
নবীজির দাসী ২৪২
দাসের সন্তান ইস্যু ২৪৪

শেষ কিংবা শুরু ২৪৬
পরিশিষ্ট ২৫৪

শুরুর আলাপ

> ❝ প্রতিটি মানবশিশু ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার পিতামাতা তাকে ইহুদি বানায়, খ্রিস্টান বানায়।[১]

ফিতরাত হলো মানুষের সহজাত বোধ। অধুনা বিজ্ঞানীরাও দেখেছেন— **শিশুরা সহজাতভাবেই সর্বশক্তিমান একক স্রষ্টায় বিশ্বাসী:**[২]

- অধ্যাপক জাস্টিন ব্যারেট তাঁর '*Born Believers: The Science of Children's Religious Belief*' বইয়ে সিদ্ধান্ত টেনেছেন: শিশুরা প্রাকৃতিক ধর্মে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে গোটা দুনিয়া একজন স্রষ্টা নির্মাণ করেছে, যিনি মানবীয় বৈশিষ্ট্যের ঊর্ধ্বে।

- ১৫১ জন নাস্তিক ফিনিশ প্রাপ্তবয়স্কের ওপর, ১৪৮ জন প্রাপ্তবয়স্ক নাস্তিক উত্তর-আমেরিকানের ওপর এবং ৩৫২ জন প্রাপ্তবয়স্ক উত্তর আমেরিকানের ওপর (নাস্তিক-আস্তিক মেশানো) করা ৩টি রিসার্চে উঠে এসেছে: সচেতনভাবে ধর্মহীন হওয়াটা অত্যন্ত কষ্টকর, প্রকৃতিকে পরিকল্পিত হিসেবে দেখার প্রবণতা গভীরভাবে স্বভাবগত। জীবিত-জড় ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুগুলোকে বাইরের কোনো স্রষ্টার সৃষ্ট হিসেবেই দেখেন ফিনল্যান্ডের নির্ধার্মিকেরা, এবং এই সৃষ্টির কোনো উদ্দেশ্য আছে— তাও তারা স্বীকার করেন।

- অধ্যাপক ডেবোরাহ কেলমেন তাঁর *'Are Children Intuitive Theist'* প্রবন্ধে নানান রিসার্চ ঘেঁটে সিদ্ধান্তে এসেছেন: ৫ বছরের দিকে শিশুরা বুঝতে শুরু করে প্রকৃতি মানবসৃষ্ট নয়। ৬-১০ বছরের শিশুরা প্রকৃতির মাঝে একটি মহৎ কোনো উদ্দেশ্য টের পায়। শিশুদের ব্যাখ্যামূলক মনোভাবকে 'সহজাত আস্তিক্যবাদ' বলা যেতে পারে।

---

[১] সহিহ বুখারি ১৩৫৮, সহিহ মুসলিম ২৬৫৮
[২] হামযা জর্জিস, দ্য ডিভাইন রিয়েলিটি (অনুবাদ: মাসুদ শরীফ, সিয়ান পাবলিকেশন)

- মনোবিদ পল ব্লুম প্রমাণ করে দেখিয়েছেন: একজন মহান পরিকল্পনাকারীর ওপর বিশ্বাস এবং দেহ-মনের দ্বৈত সত্তা, ধর্মের এই দুই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট কিশোরদের চিন্তায় স্বভাবগত।

- মনোবিদ অলিভেরা পেত্রোভিচ তাঁর *Natural-Theological Understanding from Childhood to Adulthood* বইয়ে মন্তব্য করেন: অতিপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যধারী ঈশ্বরে বিশ্বাসটিই স্বাভাবিক, নাস্তিকতা আরোপিত ও অর্জিত অবস্থান। ৭ গুণ বেশি স্কুলগামী শিশু বিশ্বাস করে চারপাশের এসব ঈশ্বরের সৃষ্টি।

এরপর কী হলো? শিশুকাল থেকে ১০-১৫ বছর সেক্যুলার পরিবার, সেক্যুলার সমাজ, কট্টর সেক্যুলার শিক্ষাব্যবস্থার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে আমাদের ফিতরাত নষ্ট হয়ে যায়। **সহজাত নৈতিক বোধ, সহজাত মনন, সমাজবোধ, ভালোমন্দের বিচার নষ্ট হয়ে সেখানে জায়গা করে নেয় ইউরোপীয় রুচি।** ইউরোপের এনলাইটেনমেন্ট (১৭শ-১৮শ শতাব্দী) ও মডার্নিটি (১৮৫০-১৯৪৫) থেকে উৎসারিত চিন্তাকাঠামো হয়ে পড়ে আমাদের কাণ্ডজ্ঞান। তা-ই হয়ে দাঁড়ায়, যা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষে বৃটিশ শিক্ষাব্যবস্থা-প্রণেতা লর্ড উইলিয়াম মেকোলে ১৮৩৫ সালে—

> “ এই শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা এমন একটা শ্রেণি তৈরি করতে চাই, যারা গায়ের চামড়ায় তো ভারতীয়, কিন্তু মন-মগজ-রুচিতে ইংরেজ’। [৩]

ইউরোপীয় রুচিতে যা আধুনিকতা, সেটাই আমাদের কাছে আধুনিকতা। ইউরোপ যেটাকে বলবে উন্নতি, সেটাই আমার চোখে উন্নতি। ইউরোপের চিন্তাদর্শন হয়ে দাঁড়ায় আমাদের দ্বীন। স্বাধীনতা, মুক্তি, মর্যাদা, ঠিক-বেঠিক, ভালোমন্দ প্রতিটি শব্দের পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি আমরা ধারণ করি। তারা যেভাবে পৃথিবীকে দেখে, ঠিক সেই চশমা এঁটে নিই।

এরপর হঠাৎ কারও কারও সংবিৎ ফেরে, হুঁশ আসে— কারও আসে মাঝ-দুপুরে, কারও বেলা গড়ালে, কারও শেষ বিকেলে, কারও বা গোধূলিবেলায়। দ্বীনে ফেরার পর এক দুর্নিবার ভালোবাসা থেকেই হোক, আর এতদিন অবহেলার অপরাধবোধ থেকেই হোক, কিংবা ডুবন্ত লোকের পায়ের নিচে চর ঠেকার ফিলিংস থেকেই হোক। সবকিছুর চেয়ে বেশি টান আসে কুরআন কারীম বোঝার প্রতি... সে এক দুর্নিবার আকর্ষণ। দুনিয়ার এই ইঁদুরদৌড়ের নাভিশ্বাসের মাঝে আরবি শিখে তিলাওয়াতের চেয়ে বাংলা অনুবাদ কিনে পড়াটা বেশি সেন্স মেইক করে। বিপত্তিটা বাধে তখন! ইউরোপের চশমা

---

[৩] Minute on Indian Education,2nd February, 1935; Thomas Babington Macaulay, point12.

চোখে কুরআনের সরল থেকে সরল বাংলা অনুবাদও আর হজম হতে চায় না। পশ্চিম দিচ্ছে 'শান্তি'র বাণী, কুরআন দিচ্ছে 'যুদ্ধ'-এর আদেশ। পশ্চিম গাইছে 'স্বাধীনতা'র গান, কুরআন বলছে 'দাসপ্রথা'র বিধান। পশ্চিম শেখাচ্ছে 'উন্নতি'র শিক্ষা, কুরআন দিচ্ছে 'দুনিয়াবিমুখতা'র দীক্ষা। নারীকে পশ্চিম উন্মুক্ত করেছে, কুরআন বলেছে ঘরে থাকতে। পশ্চিম বলছে সমতার কথা, কুরআন দিচ্ছে 'বৈষম্যের' আইন। প্রশ্নরা এসে ভিড় করে... কেউ কেউ উত্তর খোঁজে, না পেয়ে বা মনমতো না পেয়ে জোর করে ঈমানটুকু ধরে রাখে। কেউ মনমতো জবাব না পেয়ে পাড়ি দেয় সন্দেহবাদ ও নাস্তিকতার দিকে। মূল সমস্যাটা যে চশমায়, তা কেউ দেখিয়ে দেয় না। চশমায় ময়লা থাকলে জানালার কাঁচ ঘষে কী লাভ?

প্রথম যে বিষয়গুলো নিয়ে বড়ো ধরনের খটকা লাগে, তার মাঝে একটা হলো 'দাসপ্রথা'। কুরআনে আল্লাহ 'অধিকারভুক্ত দাস'দের সাথে ভালো ব্যবহারের কথা বলেছেন, তাদেরকে বিবাহ দেবার কথা বলেছে। তাদেরকে মুক্তিদানের চুক্তি করতে মালিকদের তাগিদ দিয়েছেন। স্ত্রী ও 'অধিকারভুক্ত দাসী'দের ছাড়া লজ্জাস্থানের ব্যবহারকে পুরুষের জন্য হারাম করেছেন, মানে 'দাসী'দের সাথে ব্যবহার হালাল করেছেন। একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া হয় এসব শুনলে। একবার মনে হয়— আমার মনে বসে যাওয়া সমতা-স্বাধীনতা-নারীর মর্যাদার 'কমনসেন্সের' সাথে মিলছে না তো। আবার মনে হয় 'সেই যুগের বই তো'। জোর করে পশ্চিমা ধারণার সাথে মেলানোর জন্য কাউকে কাউকে বলতে দেখা যায় 'ধাপে ধাপে করলেও কুরআন দাসপ্রথার বিরুদ্ধেই'।

এই প্রশ্নটা যাকেই করবেন, সেই আপনাকে ৪টা কথার যেকোনো একটা বলবে—

১. সে সময়ের অর্থনীতিই ছিল দাসনির্ভর। তাই একবারেই বন্ধ করা হয়নি। (এর সাথে দাসী-সহবাসের কী সম্পর্ক?)

২. সে সময় সমাজই ছিল এমন। দাসপ্রথা, দাসী-সহবাস স্বাভাবিক ছিল। (তাহলে কুরআন কি শুধু সে যুগের জন্যই নাযিল হয়েছে? তাহলে এযুগে কি কুরআন অপ্রাসঙ্গিক?)

৩. কুরআন তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করতে বলেছে। আগে খারাপ ব্যবহার করা হতো। (দাসপ্রথা থাকবেই বা কেন? কুরআন একে রাখবেই বা কেন? তার মানে কুরআন 'সমতা' চায় না?)

৪. সেই যুগে দাসপ্রথার হুকুম ছিল, এখন আর নেই। (ইসলামে কোনো হুকুম রহিত হয়ে গেছে, এটার দলিল থাকা জরুরি।[৪] কোন আয়াত বা কোন হাদিস দ্বারা এই বিধান মানসুখ

[৪] তবে কেউ কেউ সূরা মুহাম্মাদের ৪ নং আয়াত দ্বারা প্রমাণের চেষ্টা করে যে, যুদ্ধবন্দিদের সাথে কেবল দুই ধরনের আচরণই করা যাবে (হত্যা ও মুক্তি)। গোলাম বানানোর বিধান নাকি মানসুখ হয়ে গেছে। কিন্তু

হয়েছে, তা কেউ দেখাতে পারবে না)

যার কোনোটাই আমাদের চশমার কাঁচে লেগে থাকা ময়লা সরাতে পারে না। কেন যেন এগুলো জবাব হয়ে ওঠে না। আমাকে এই বিষয়ে কয়েকটা পয়েন্ট খুব ভাবিয়েছে—

- ➡ ইসলাম ফিতরাতের ধর্ম। সুতরাং ইসলামের বিধান আমাদের সাইকোলজির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- ➡ দাসপ্রথাকে ইসলাম যুদ্ধবন্দির সাথে খাস করেছে, সুতরাং মানুষের 'যুদ্ধকালীন সাইকোলজি'র সাথে এর সংযোগ রয়েছে।
- ➡ কুরআনের বিধান কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর দেওয়া 'জীবনের মূলনীতি'। তাই যদি হয়, তবে তো যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে দাসপ্রথার বিধান তো কিয়ামত পর্যন্ত প্রাসঙ্গিক হবার কথা। তাহলে বর্তমান সভ্যতা যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে কী বিধান দেয়? সেটা কি একইসাথে মানবিক এবং প্র্যাকটিক্যাল? দুটোই হওয়া চাই।

২০১৭ সালে 'ডাবল স্ট্যান্ডার্ড' বইটিতে প্রথম লিখেছিলাম, খুবই সংক্ষিপ্ত ছিল। গত ৪ বছরে পড়াশোনা বেড়েছে, নতুন নতুন মাত্রায় উপলব্ধি করার সুযোগ হয়েছে 'দাসপ্রথা'র বিষয়টি। সম্পাদক মুশফিকুর রহমান মিনার ভাইয়ের সাথে একটা ৪ ঘণ্টার লাইভ প্রোগ্রাম হয়েছিল ফেসবুকে। সেটি **মুহাম্মদ হোসাইন** ভাই শ্রুতিলিখন করে দিয়েছিলেন। তার সাথে আরও দার্শনিক ও ঐতিহাসিক আলাপ জুড়েছি। সেটাই আজ আপনার হাতে 'ইসলামে দাস-দাসী ব্যবস্থা: যুদ্ধ-মনস্তত্ব ও বাস্তবতা' বইটি। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে বিভিন্ন শরঈ ব্যাখ্যা, সংশোধনী ও রেফারেন্স সংযোজন করে বইটিকে শক্ত ইলমী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন **উস্তায মুফতি আবদুর রহমান** হাফিযাহুল্লাহ, ফলে বইয়ের চেহারাই বদলে গেছে। **উস্তায ইফতেখার সিফাত, উস্তায মানযুরুল কারীম** ও **মুশফিকুর রহমান মিনার ভাই** পাণ্ডুলিপি দেখে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন।

বইটির মূল বিষয় 'ইসলামের দাসপ্রথা'র ধারণা নিয়ে হলেও পাঠক এর মাঝে খুঁজে পাবেন পাশ্চাত্য দর্শন, উপনিবেশবাদ, দাসপ্রথার আধুনিক ধরন ইত্যাদি নানামাত্রিক আলোচনা, যা তাকে একটা সামগ্রিক আঙ্গিকে বিষয়টি বোঝার ও অনুভবের সুযোগ এনে দেবে ইনশাআল্লাহ।

শামসুল আরেফীন

২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২২

কথাটা যে ভুল, তা জানার জন্য দেখুন তাফসিরে রুহুল মাআনী ২৫/৩৬-৩৭ এবং ফতহুল বয়ান ৯/৫ — শারঈ সম্পাদক।

অন্যান্য ইতিহাসবিদদে মতে, মোট দেড় কোটি থেকে ৬ কোটি লোক নিহত হয় মোঙ্গলদের হাতে।[১১৪]

২. দাস বানানো

পরাজিত সেনাদের আটক করা হতো। এরপর হয় দাস বানিয়ে বিজয়ী সেনাদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া (Enslavement) হতো। নয়তো মুক্তিপণ (ransom) নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হতো, কিংবা বন্দি বিনিময় করা হতো। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের জনক Hugo Grotius ১৬২৫ সালে একটা কথা বলেছেন:

> “ The victor has the right to enslave. [De jure belli ac pacis (1625; On the Law of War and Peace)] [১১৫]

অর্থাৎ, বিজয়ীর অধিকার আছে দাস বানানোর। তিনি একথা বলছেন ১৭শ শতকে, আমেরিকা দাসপ্রথা এবোলিশ করেছে ১৯শ শতাব্দীতে। আমেরিকার প্রেসিডেন্টরা ছিলেন বড়ো বড়ো দাসমালিক। হেগেলরা বলেছেন ১৮৩০ সালে। ধরেই নিচ্ছি ইসলামের দাসপ্রথা বহাল রাখার পেছনে কোনো ঐশী প্রজ্ঞা নেই, নিরেট বস্তুবাদী ইতিহাস পাঠের নিরিখে দেখলেও এটা কীভাবে আশা যায় যে, ১৭ শ শতকে যে ধারণা টিকে আছে, ৭ম শতাব্দীতে বসে অর্থাৎ ১০০০ বছর আগে ইসলাম তা বিলোপ করবে? ইসলামবিদ্বেষীরা যখন বলে, ইসলাম কেন দাসপ্রথা এবোলিশ করল না— এটা কি ইতিহাসের সাথে তামাশা ছাড়া আর কিছু? এই ফাতরামিকে বলে Presentism, মানে হলো বর্তমানের খাপের ভেতরে অতীতকে বিচার করা। অবশ্য, ইসলাম আমাদের কাছে অতীত না, ইসলাম আমাদের কাছে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ, কিয়ামত অব্দি।

যা হোক, ইতিহাসে এই দুটো আচরণই হয়ে এসেছে যুদ্ধবন্দিদের সাথে। আধুনিক সভ্যতা যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে সর্বোচ্চ যে অর্জন দেখিয়েছে, তা হলো ‘জেনেভা কনভেনশান’। কেমন আচরণ বিজয়ী করবে পরাজিতের সাথে যুদ্ধের মাঠে, সেটার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এতে। প্রথম দুটো কনভেনশন (১৮৬৪ ও ১৯০৬) ছিল মূলত যুদ্ধকালীন কিছু নৈতিক মূল্যবোধকে সামনে নিয়ে, যেমন যুদ্ধবন্দিকে হত্যা না

---

[১১৪] necrometrics.com

[১১৫] Britannica, T. Editors of Encyclopaedia (2018, December 11). Prisoner of war. Encyclopedia Britannica.

করা, রোগী-আহতদেরকে 'নিরপেক্ষ' মনে করা ইত্যাদি। ১৯২৯ সালে ৩য় জেনেভা কনভেনশান প্রধানত prisoners of war (POW) বা যুদ্ধবন্দিদের বিষয়ে কিছু rules & regulations তৈরি করে ১ম বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে নতুন করে ৪র্থ কনভেনশন বানানো হয়। ১৮০টি দেশ এতে স্বাক্ষর করে। তাও হয় না, ১৯৭৭ সালে আরও দুটো ধারা যুক্ত করা হয় যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনার ব্যাপারে।[১১৬]

এখন আমরা দেখবো, একের পর এক এসব কনভেনশন যুদ্ধবন্দিদের রক্ষা করতে পেরেছে কি না। যদি না পারে, তাহলে কেন পারেনি।

[১১৬] Malcolm Shaw (March 04, 2020). Geneva Conventions 1864–1977. Encyclopedia Britannica [Sir Robert Jennings Professor of International Law, University of Leicester, England]

জেনেভা কনভেনশন ১৯২৯

জেনেভা কনভেনশন পড়লে আপনি মুগ্ধ হয়ে যাবেন। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবেন— আহ! কী মহান। এরা তো মানুষ না, সাক্ষাৎ ফেরেশতা। **ইউরোপের রাষ্ট্রদর্শন, অর্থদর্শন পড়লে দেখবেন বলা হচ্ছে: মানুষ স্বার্থপর ও বদ, তাই শক্তিশালী রাষ্ট্র প্রয়োজন। যে রাষ্ট্র তাদের স্বেচ্ছাচারিতা দমন করে বিকাশ নিশ্চিত করবে। অর্থদর্শনে বলা হচ্ছে: মানুষকে নিজ সীমাহীন চাহিদা পূরণের সুযোগ দিতে হবে, মানুষ স্বার্থপর ও ভোগমনা। কিন্তু যুদ্ধে এসে আপনি দেখবেন উল্টো, যেন যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষ আর স্বার্থপর নেই, আর টিকে থাকার প্রতিযোগিতা নেই, এখানে সবাই সাধু, সবাই পরোপকারী-সৎ-নিষ্ঠাবান। নিজে যা খায়, অপরকে তাই খাওয়ায়।**

পরিশিষ্ট-১ এ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতিটি ধারার সারমর্ম বা মূল বক্তব্য দেওয়া রইল। বাস্তবতা হলো, কোনো রাষ্ট্রই এই রুলস মানেনি। খাতাকলমে মুখরোচক আইন হিসেবে রয়ে গেছে। ইতিহাসের দিকে তাকালেই আমরা দেখবো জেনেভা কনভেনশান এ অংশ নেওয়া রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধবন্দিদের ওপর কতটুকু কনভেনশন মেনেছে। চলুন নিয়ে যাই আপনাদের।

১. যুদ্ধবন্দিদের কাজে নিয়োগ (forced labour)

আটককারী রাষ্ট্র যুদ্ধবন্দিদের দ্বারা কাজ নিতে পারবে। কাগজ কী বলছে, দেখুন।

পর্ব ৩: যুদ্ধবন্দিদের কাজ

২৭. অফিসার ছাড়া বাকিদেরকে কাজে নিয়োগ করা যাবে। শুধু দেখভাল-টাইপ কাজে (supervisory) বাধ্য করা যাবে। কাজ করতে গিয়ে আহত হলে, ক্ষতিপূরণ পাবে।

২৮. বন্দিদের **ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা হলে**, সকল দায়দায়িত্ব বহন করবে বন্দিকারী বাহিনী।

২৯. **সাধ্যাতীত কাজে লাগানো যাবে না।**

৩০. বেসামরিক লোকদের মতো কর্মঘণ্টা। সপ্তাহে রবিবার ছুটি।

৩১. সামরিক যেকোনো কাজে লাগানো যাবে না।

৩২. **অস্বাস্থ্যকর বা ঝুঁকিপুর্ণ কাজে লাগানো যাবে না।**

৩৩. ক্যাম্পের মতোই স্বাস্থ্যকর ও ফ্যাসিলিটি থাকতে হবে শ্রমিক-ক্যাম্পে। **বন্দি ক্যাম্পের কাছাকাছি হতে হবে।**

৩৪. ক্যাম্প ম্যানেজমেন্টের কোনো কাজে লাগালে বেতন পাবে না। অন্যান্য কাজে যুদ্ধরত উভয় পক্ষ ঠিক করবে যুদ্ধবন্দিদের বেতন। **যতদিন ঠিক না হচ্ছে, ততদিন বন্দিকারী বাহিনীর সমানই বেতন পাবে।**

- ২য় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুদ্ধবন্দি-কেন্দ্রিক সব সিদ্ধান্তগুলো আমেরিকা একাই নিত, বাকিরা কেবল তামিল করত। কেবল ৩টা সিদ্ধান্ত ছিল সম্মিলিত, ৩টাই জেনেভার লঙ্ঘন। জেনেভার মূল কুশীলবরাই একাট্টা হয়ে নিজেদের করা কনভেনশন ভেঙেছে—

  ১. রেডক্রস প্রতিনিধিদের আমেরিকা-বৃটিশ-কানাডীয় ক্যাম্পে ঢুকতে না দেওয়া।

  ২. ইউএস-ইউকে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, **দেশ পুনর্গঠনে খাটানোর জন্য ফ্রান্সকে যুদ্ধবন্দি দেওয়া হবে** (reparation labour)

  ৩. বন্দিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি**ছু বন্দি দেওয়া হবে সোভিয়েতকে (একই উদ্দেশ্যে)**। অথচ সোভিয়েত জেনেভায় সই করেনি, আমেরিকা জেনেভা কনভেনশনের উদ্যোক্তাদের একজন। এই আশায় বহু জার্মান বন্দি সোভিয়েত রেড আর্মির কাছে আত্মসমর্পণ না করে ইস্টার্ন ফ্রন্ট থেকে পালিয়ে এসে আমেরিকানদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল। জেনেভা কনভেনশনের ৩(৮) ধারায় ছিল অন্যত্র সরাতে হলে বন্দিদের সম্মতি ছাড়া সরানো যাবে না। কোথায় নেওয়া হচ্ছে, কেন, এসব জানাতে হবে। অসুস্থ হলে সরানো যাবে না। আমেরিকার অধীন বন্দিরা অধিকাংশই ছিল অসুস্থ। সামনে দেখব আমরা।

- ১৯৪৪ সালে মিত্রপক্ষীয় 'ইয়াল্টা কনফারেন্স'- অনুসারে মিত্রপক্ষ জার্মান বন্দিদের দিয়ে দেশ পুনর্গঠন করবে। এবং ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত এদেরকে বাধ্যশ্রমে (slave labour) লাগানো হয়েছিল।[১১৭] কাজ করানো হয়েছে খনিতে, শিল্প

[১১৭] Eugene Davidson "The death and life of Germany: an account of the American occupation". p.121

"In accordance with the Yalta agreement, the Russians were using slave labor of millions of Germans and other prisoners of war and civilians'".

স্থাপনা নির্মাণে ইত্যাদি ঝুঁকিপূর্ণ কাজে। অথচ কনভেনশনে ছিল সশস্ত্র মোকাবেলা শেষ হওয়া মাত্র দ্রুত নিরপেক্ষ ভূমিতে বন্দিদেরকে সরানো হবে। তারাই এসব কনভেনশন করে, তারাই চুক্তি করে একসাথে মিলে ভাঙে। তাদের স্বার্থে যা যা করা দরকার তা-ই করে, এসব কনভেনশনটন তাদের জন্য না।

সোভিয়েতনামা

১৯৪৫ সালে সোভিয়েতের হাতে ছিল ২৮ লক্ষ জার্মান যুদ্ধবন্দি। এদের লাগানো হয়েছিল বিধ্বস্ত সোভিয়েত পুনর্গঠনে। যার মাঝে মরে গেছে সোভিয়েত রেকর্ড মতেই সাড়ে ৪ লাখ। [১১৮] জোয়ান সেনা ৪ লাখ মরা মানে বুঝে নিতে হবে। শুধু তাই নাকি? পূর্ব ইউরোপের জাতিগত **জার্মান সংখ্যালঘু সিভিলিয়ানদেরও জোরপূর্বক তুলে এনে সোভিয়েতে খাটানো হয়, আর দখলকৃত পূর্ব জার্মানির সিভিলিয়ানদেরকেও, এমনকি নারীদেরকেও।** রাশিয়ান আর্কাইভ-ই বলছে:[১১৯]

কোন দেশ থেকে	কত জন সিভিলিয়ান	
	রাশিয়ান আর্কাইভ অনুসারে	Schieder commission-এর মতে
পোল্যান্ড	১,৫৫,২৬২	২,১৮,০০০
রোমানিয়া	৬৭,৩৩২	৭৫,০০০
হাঙ্গেরি	৩১,৯২০	৩০-৩৫ হাজার
যুগোশ্লাভিয়া	১২,৫৭৯	২৭-৩৫ হাজার
দখলকৃত জার্মানি	৪,৫৭৯	
মোট	২,৭১,৬৭২ জন	
১৯৪৯ সালে ফেরত	২,০১,৪৬৪	
মৃত	৬৬,৪৫৬	১, ২০,০০০
১৯৪৯ ডিসেম্বর অব্দি রয়ে গেছে	৩,৭৫২	

আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন: তুলে এনে এভাবে কাজে লাগানো-কে কী বলে?

[১১৮] G. I. Krivosheev. Soviet Casualties and Combat Losses. Greenhill 1997 ISBN 1-85367-280-7 Pages 276-278

[১১৯] Pavel Polian-Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR Central European University Press 2003 Pages 293-295

দাসপ্রথার সাথে এর পার্থক্যগুলো কী কী? তাহলে আমরা কেন বলছি যে, পশ্চিমা সভ্যতা দাসপ্রথাকে বিলোপ করেছে? আচ্ছা সোভিয়েত বাদ দেন, সোভিয়েত সই করেনি জেনেভা কনভেনশনে, তাদের মানারও অত দায় নেই। কিন্তু ফ্রান্স?

ফ্রান্স-নামা

পুরো ফ্রান্স জুড়ে ১০০-এর বেশি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে। ১০ লক্ষ জার্মান যুদ্ধবন্দি যুদ্ধশেষে ৪-৫ বছর ফ্রান্সে বাধ্যশ্রম দিয়েছে, যদিও কনভেশন মোতাবেক যুদ্ধ থামলেই তাদের হস্তান্তর করার কথা। বেশিরভাগই এসেছে আমেরিকান ক্যাম্পগুলো থেকে। ফ্রান্স চেয়েছিল ১৭ লাখ। আরেক হিসেব বলছে, আমেরিকা দিয়েছে ১৩ লাখ। সিপাহী Heinz T. ছিল তাদের একজন। সে বলছে:

> “ চারপাশে দেখছি হাড় জিরজিরে লোকজন, ক্ষুধার কারণে শরীরে পানি এসে গেছে কারও কারও, শতচ্ছিন্ন কাপড়, নোংরা, পাংশু চেহারা, টলমল পা ফেলছে... ফরাসিদের দেবার জন্য আজীব গিফট।

ইতিহাসবিদ Fabien Theofilakis, যাঁর গবেষণার বিষয়ই ফ্রান্সে জার্মান যুদ্ধবন্দি নিয়ে, তিনি জানিয়েছেন: ৪০ হাজার বন্দি মারা যায় অনাহারে-অর্ধাহারে।[১২০] খুব কনভেনশন হয়েছে।

১৯৪৭ এর দিকে আমেরিকা খুব চাপ দিচ্ছিল এদের ছেড়ে দেবার জন্য, কেননা স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সোভিয়েত পূর্ব জার্মানি প্রতিষ্ঠার জন্য বন্দিদের ছেড়ে দিচ্ছে। একটা অংশকে কম্যুনিস্ট বানিয়ে। এখন এদেরকে ছেড়ে দিয়ে পশ্চিম জার্মানি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৯৪৮ এর শেষাশেষি সবাইকে পাঠিয়ে দেবার কথা থাকলেও এই সস্তা শ্রম কি হাতছাড়া করা যায়? ফ্রান্স বলল, **এখন থেকে তোমাদের পারিশ্রমিক দেওয়া হবে**, কে কে থাকবা বলো। ১,৩৭,০০০ বন্দি পেল সিভিলিয়ান শ্রমিকের মর্যাদা। **তাহলে এতদিন (৩ বছর) কী ছিলো এরা?** কী ছিল এদের সামাজিক মর্যাদা? রাষ্ট্রীয় দাস? তাহলে কনভেনশন যে বলল সমান বেতন দেবে?

২. যুদ্ধবন্দিদের ভরণপোষণ

কনভেনশনের ধারা অনুসারে:

---

[১২০] Deutsche Welle, After WWII, German POWs were enlisted to rebuild France

৪. **বন্দিদেরকে বন্দিকারী পক্ষ ভরণপোষণ দেবে।** অফিসারদের, নারীদের, অসুস্থদের, টেকনিক্যালদের আলাদা সুবিধায় রাখতে হবে।

১০. তাদের **আবাসন মান, জনপ্রতি স্থান সংকুলান, বিছানাপত্র হতে হবে হেফাজতকারী বাহিনীর মতোই।**

১১. **বন্দিকারী বাহিনীর সমান খাদ্য** বরাদ্দ থাকতে হবে। পর্যাপ্ত পানি ব্যবহার, ধূমপানের সুযোগ।

১২. **বন্দিকারী পক্ষ বন্দিদেরকে পোশাক, জুতো, অন্তর্বাসের ব্যবস্থা করবে।** রেগুলার সেগুলো পরিবর্তন করবে। ক্যান্টিন থাকতে হবে, ক্যান্টিনের লাভও বন্দিদের জন্য ব্যয় হবে।

২২. **অফিসার বন্দিদেরকে ভাতা দেবে বন্দিকারী বাহিনী।**

২৩. **বন্দি অফিসাররা বন্দিকারী বাহিনীর একই র‍্যাঙ্কের সমান বেতন পাবে।** মাসের বেতন মাসে দেওয়া। কোনো কাটা যাবে না নিজেদের খরচ বাবদ। এটা যুদ্ধ শেষে বন্দির পক্ষ পরিশোধ করে দেবে। (কিন্তু সে পর্যন্ত তো খরচ করতে হবে। আর যদি ভূখণ্ড একীভূত করে নেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে বন্দির নিজ দেশ বলে আর কোনো অথোরিটি থাকে না, যারা তাকে বুঝে নিবে একদিন)

তাহলে বলা হলো যে: যুদ্ধবন্দিদেরকে ডিটেনশান ক্যাম্পে রাখা হবে, যাতে তারা আবার আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে (regroup) না পারে। তাদেরকে এখানে অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসা-শিক্ষা দেওয়া হবে। যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয়। বিবেক দিয়ে একটু চিন্তা করেন তো, এটা কি আদৌ লজিক্যাল আর বাস্তবসম্মত? যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এরা যুদ্ধ করতে এসেছে, সেই রাষ্ট্র এদেরকে অর্থ খরচ করে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে? তাও আবার যতদিন না যুদ্ধ শেষ হয়, ৫ বছর লাগলে ৫ বছরই খাওয়াবে? এর চেয়ে তো মেরে দিলেই ল্যাঠা চুকে যেত, পয়সা বেঁচে যেত। বাস্তবেও ঠিক সেটাই হয়েছে।

- ২য় বিশ্বযুদ্ধে জাপান তো গোপন সরকারি আদেশই দিয়ে দিয়েছে: সব যুদ্ধবন্দিদের হত্যা করে গার্ডদের পালিয়ে যাওয়ার বৈধতা দিয়ে।[১২১]

- কানাডার মিলিটারি হিস্টরি ম্যাগাজিন Legion অকপটে স্বীকারই করেছে:

> ❝ যুদ্ধক্ষেত্রে সেনারা বন্দিদের হত্যা করেই থাকে, হয়ত তার কোনো সতীর্থ নিহত হবার রাগে, কিংবা বন্দিকে টানার ঝামেলামুক্ত হতে। **এসব যুদ্ধে সবসময়**

[১২১] Taiwan Documents, Order Telling Guards to Flee to Avoid Prosecution for War Crimes Order to Kill All POWs.

হয়েই থাকে। অবশ্যই কানাডীয় বাহিনীও আত্মসমর্পণের পরও জার্মান সেনাদের হত্যা করেছিল।[১২২]

- আর আমেরিকা খোদ ৫০ লক্ষ জার্মান সেনাদেরকে PoW স্ট্যাটাসের বদলে Disarmed Enemy Forces (DEF) স্ট্যাটাস দিয়েছে, যাতে খাওয়ানোর ঝামেলা আমেরিকার ওপর না বর্তায়। PoW বললে তো জেনেভা কনভেনশন মানতে হবে, নিজ সেনাদের সমান ফ্যাসিলিটি দিয়ে রাখতে হবে। বলা হলো, এদেরকে খাওয়াবে জার্মান অথোরিটি (?)। ২য় বিশ্বযুদ্ধ শেষে জার্মান অথোরিটি-টা কেডা ভাই? ফলস্বরূপ নিদারুন অব্যবস্থার মধ্য দিয়ে পদ্ধতিগত গণহত্যার (methodological genocide) দ্বারা নিহত হলো ১০ লাখ জার্মান যুদ্ধবন্দি। সামনে আরও বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব, এবং ইসলামি দাসপ্রথার সাথে তুলনা করবো।

- মে, ১৯৪৩-এ যখন উত্তর আফ্রিকায় মিত্রপক্ষের হাতে লক্ষ লক্ষ জার্মান সেনা বন্দি হয়, তখন আইজেনহাওয়ারের অভিযোগের জবাবে আমেরিকার আর্মি চীফ George C. Marshall মন্তব্য করেছিলেন: আফসোস! আরও কিছু মেরে দিতে পারতাম।[১২৩]

- যে দেশ যুদ্ধবন্দিদের পালবে, তার নিজেরও তো সক্ষমতা থাকতে হবে। সে নিজেও তো যুদ্ধবিধ্বস্ত। নিজের সেনাদের পেলেপুষে আবার শত্রুসেনাদেরকেও সমান সুবিধা দিয়ে অনির্দিষ্টকাল পালো! একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পক্ষে কীভাবে সম্ভব শত্রুপক্ষের লাখো সেনাকে নিজ সেনার মতো প্রিমিয়াম সেবা দেওয়া। এটাই কাগজ আর ময়দানের পার্থক্য। বললেই হলো? নিজের জনগণ সামলাতেই যে হিমশিম খাচ্ছে। ইতিহাসবিদ Fabien Theofilakis, যাঁর গবেষণাই ফ্রান্সে জার্মান যুদ্ধবন্দি নিয়ে, তিনি জানিয়েছেন: ৪০ হাজার বন্দি মারা যায় অনাহারে-অর্ধাহারে। যদিও প্রতিশোধ ইত্যাদির চেয়ে **যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের সক্ষমতাই ছিল না এদেরকে কনভেনশন অনুযায়ী রাখার**। গরুর বগিতে করে আনা হতো ওদের।[১২৪] ১৯৪৪ এর মার্চে অধিকাংশ বগি খুলে জার্মান বন্দিদের মৃত পাওয়া যেত, দমবন্ধ হয়ে। জি,

---

[১২২] Legion Magazine (Canadian military history magazine) Was it right to commute Kurt Meyer's death sentence for killing Canadian PoWs? March 16, 2021

"Soldiers kill prisoners on the battlefield because they are angry a friend was killed or feel they can't escort a PoW to the rear. Such acts have always occurred in war. Certainly Canadian soldiers have killed surrendering Germans."

[১২৩] James Bacque, The Other losses

[১২৪] Deutsche Welle, After WWII, German POWs were enlisted to rebuild France

এটাই হচ্ছে যুদ্ধের বাস্তবতা। এসিরুমে বসে জেনেভার মতো বাফার শহরে বড়ো বড়ো তত্ত্ব কপচানোই যায়।

মাতবরনামা

যুদ্ধ তো আসলে বিজয়ীর জন্যও একটা অর্থনৈতিক চাপ। আমেরিকা নিজে যুদ্ধবিধ্বস্ত ছিল না, মূল ফ্রন্ট থেকে হাজার মাইল সাগর পেরিয়ে আমেরিকা। সেই আমেরিকাই যে ন্যাক্কারজনকভাবে জেনেভা কনভেনশন এড়িয়ে যাবার কায়দা করেছে, সেখানে ফ্রান্সের কাছে তো আশাই করা যায় না। পাঠক, এখন আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি এক অজানা ইতিহাসে। সভ্যতার আর কাগুজে মানবতার মুখোশের আড়ালে এক চেপে রাখা ইতিহাস।

১৯৮৯ সালে কানাডীয় গবেষক James Bacque লিখলেন *The Other losses*. সাত জন দুঁদে আমেরিকান ইতিহাসবিদ এর প্রতিবাদ করলেন, খণ্ডন লিখলেন। কিন্তু একজন সম্মতি দিলেন তাঁর দেওয়া তথ্যগুলোয়। সেই একজন হলেন United States Army Center of Military History-এর সাবেক সিনিয়র ইতিহাসবিদ Colonel Ernest F. Fisher, যিনি ১৯৪৫ সালে জার্মানিতে আমেরিকান সেনাদের কীর্তিকলাপের তদন্তে জড়িত ছিলেন। তিনি লিখলেন এই বইয়ের ভূমিকা। পাঠক, ভয়ের জগতে প্রবেশ করছেন আপনি। কর্নেল Fisher বলছেন ভূমিকাতে:

> ❝ ৫০ লক্ষ জার্মান সৈন্য বন্দি ছিল আমেরিকা ও ফ্রান্সের নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পগুলোয়, কাঁটাতার-জড়ানো খাঁচায়, গায়ে গায়ে লেগে... খোলা আকাশের নিচে, ন্যূনতম পয়ঃনিষ্কাশন ছাড়া, অনাহার-অর্ধাহারে শীঘ্রই মরা শুরু হলো রোগে-ক্ষুধায়। ১৯৪৫ এর এপ্রিল থেকে আমেরিকান ও ফরাসি বাহিনী পদ্ধতিগতভাবে নির্বিচারে নিধন করল ১০ লক্ষ মানুষ, আমেরিকান ক্যাম্পেই বেশি। ৪ দশক ধরে আর্কাইভের ধুলোয় চাপা পড়ে আছে এই নজিরবিহীন ট্র্যাজেডি।

বইয়ের মূল বক্তব্যগুলো সংক্ষেপে আপনাদের সামনে পেশ করছি।

- ৪-১২ অব্দি রেডক্রসকে ঢুকতেই দেয়নি, যেটা কনভেনশন মোতাবেক হওয়ার কথা ছিল। রেডক্রস তাদের ওয়েবসাইটে লিখেই রেখেছে:

> ❝ **মিলিয়ন মিলিয়ন** জার্মান সেনা বন্দি হয় জার্মানি আত্মসমর্পণের পর (৮ মে, ১৯৪৫)
>
> সেপ্টেম্বরের দিকে আমরা এসব ক্যাম্পে যাবার আবেদন করলাম। ফরাসি ও বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত অংশে আমাদের ঢুকতে দিল।

> ফেব্রুয়ারি, **১৯৪৬ এ ঢুকলাম আমেরিকান জোনে (৯ মাস পর)।**
>
> এপ্রিলে ঢুকলাম সোভিয়েত জোনে (১ বছর পর)।
>
> **আমরা যখন ঢুকলাম, তখন অল্প বন্দিকেই পেয়েছিলাম।** যাই হোক, তাদেরকে রাখা হয়েছিলো ভয়াবহ অবস্থায়। [১২৫]

- লেখক বলছেন, ফ্রান্সে আমাদের রিসার্চ শেষে আমেরিকা ফিরলাম, পেনসিলভ্যানিয়ার আমেরিকার জাতীয় আর্কাইভে ঢুকলাম। সেখানে Weekly PoW and Disarmed Enemy Forces Report- শিরোনামে বেশ কিছু নথি পেলাম। প্রত্যেকটি রিপোর্টে 'Other Losses' নামে একটা শিরোনাম ছিল, যার নিচে আমেরিকা ও ফ্রান্সের পরিসংখ্যান পাশাপাশি। এই 'Other Losses' মানে কী? কে বলবে এর মানে কী? অনেকে বলল, এর মানে হলো: বন্দি ট্রান্সফার ও মুক্তি।

পেয়ে গেলাম মিত্রপক্ষের Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Forces (SHAEF)-এর Chief of the German Affairs কর্নেল Philip Lauben-কে, যিনি সেই সময় যুদ্ধবন্দি ট্রান্সফার ও ফেরতেরই দায়িত্বে ছিলেন। তিনি বললেন:

– এর মানে হলো 'মৃত্যু এবং পলায়ন'।

– কত জন পলায়ন করেছে?

– 'খুব, খুব সামান্য'। পরে আমি হিসেব করে দেখলাম ১ পার্সেন্টের ১০ ভাগের ১ ভাগ (০.১%) পলাতক। অর্থাৎ other loss মানে পুরোটাই মৃত (৯৯.৯৯%)।

- ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৫ এ ব্রিগেডিয়ার ডেভিস সতর্ক করেন মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক আইজেনহাওয়ারকে: 'বন্দিদেরকে PoW স্ট্যাটাস দেবার ফলে যে ব্যাপক সাপ্লাই চাহিদা দেওয়া হচ্ছে, সেটা পূরণ করা সম্ভব হবে না'। [১২৬] মার্চের ১০ তারিখ আইজেনহাওয়ার ওপরে অনুমতি চেয়ে চিঠি লেখেন যে, VE day (Victory in Europe, 8 May 1945) এর পর যত বন্দি আসবে সবাইকে (২০ লাখ) **জেনেভা কনভেনশন বাইপাস করা যায়, এমন কোনো ক্যাটাগরিতে দেবার।** প্রস্তাব অনুমোদন হয় এপ্রিল, ১৯৪৫-এ। **শুধু আমেরিকার হাতে বন্দিদের জন্য** 'যুদ্ধবন্দি' (PoW) এর পাশাপাশি নতুন একটা ক্যাটাগরি করা হয়— Disarmed

[১২৫] ICRC in WW II: German prisoners of war in Allied hands, 02-02-2005

[১২৬] James Bacque, The Other losses , p24

Enemy Forces (DEF)। এদের ব্যাপারে নীতিমালা হলো:

...খ) DEF-দের **খাদ্য ও ভরণপোষণের দায়িত্ব আমেরিকার না, জার্মানদের।**

গ) শুধু যুদ্ধাপরাধী বা সন্দেহজনক যুদ্ধাপরাধীদের আমেরিকা রাখবে।

ঘ) DEF স্ট্যাটাসের ব্যাপারে কোনো প্রকাশ্য ঘোষণা দেওয়া হবে না।

বৃটিশরা এটা প্রত্যাখ্যান করে। এবং সাফ সাফ জানিয়ে দেয়, যাদেরকে 'জেনেভা কনভেনশন' মোতাবেক রাখতে পারবে না, তাদের রাখার জন্য এই টার্ম তারা ব্যবহার করবে না [১২৭]। আমেরিকা এই ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সাপোর্ট চাচ্ছিল, কেন না তারা উভয়েই জানত: এই স্ট্যাটাসের অধীনে বন্দি যারা হবে, তাদের পরিণতি মৃত্যু। বিধ্বস্ত জার্মানি কীভাবে খাওয়াবে এই মিলিয়ন বন্দিকে? আসলে আমেরিকা জেনেভা কনভেনশনকে এড়ানোর উপায় খুঁজছিল। General Hughs বলেছেন: 'আমার ধারণা, সবাই জেনেভা কনভেনশনের ভয়ে আছে'।

- অথচ ওদিকে আইজেনহাওয়ার বার বার দাবি করেছে যে,

> “ জার্মানদের যদি বোধবুদ্ধি থেকে থাকে, তাদের বোঝার কথা যে, ব্রিটেন ও আমেরিকার পুরো ইতিহাসই পরাজিত শত্রুর সাথে মহানুভবতার ইতিহাস। আমরা জেনেভা কভেনশনের সব আইন মেনে চলছি।

কেমন মেনে চলছে যে, ৩টার কোনোটাই দেওয়া হয়নি।

১. বন্দিদেরকে ইউএস আর্মি ক্যাম্পের মতো এক মানসম্পন্ন খাদ্য ও আশ্রয় দেওয়া হবে।

২. তাদেরকে চিঠিপত্র আদান প্রদান করতে দেওয়া হবে।

৩. রেডক্রসের প্রতিনিধিরা তাদেরকে ভিজিট করতে আসবে। কোনো অব্যবস্থা পেলে তা জার্মান বা আমেরিকান কর্তৃপক্ষকে নোটিশ করবেন। ৯ মাস অনুমতি দেওয়া হয়নি।

চলুন পাঠক আপনাদের নিয়ে যাই, আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত বন্দি ক্যাম্পে। আমেরিকান মায়ের সন্তান আধা-জার্মান Charles von Luttichau বন্দি ছিল Kripp ক্যাম্পে। তার জবানিতে:

খাদের ওপর দিয়ে গাছের গুঁড়ি ফেলে দিয়ে টয়লেট বানানো ছিল। এক ক্ষীণকায় কিশোর তার ভেতর দিয়ে গলে পায়খানায় ডুবে মরেছে। হাত দিয়ে মাটিতে গর্ত করে তার ভেতর গাদাগাদি হয়ে ঘুমাতে হতো। কেউ কেউ বেশি দুর্বলতার দরুন টয়লেট অব্দি যেতে পারতো না, কেউ কেউ তো প্যান্টও খুলতে পারত না। কাপড়চোপড়, এমনকি মাটি পর্যন্ত দূষিত হয়ে ছিল। বৃষ্টি ছাড়া পানির আর কোনো ব্যবস্থা ছিল না। একটা পাইপ দিয়ে পানি আসত, সেখান থেকে কয়েক ঢোক পেতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, এমনকি

[১২৭] ibid, p27

সারা রাতও দাঁড়িয়ে থাকা লাগত। বৃষ্টি লাগাতার চলত, আমার অবস্থানকালের অর্ধেকই কেটেছে বৃষ্টিতে ভিজে আর খাবার ছাড়া। বাকি দিনে খাবার পেতাম তাদের নিজেদের সেনা বরাদ্দের ১/১০ অংশ। আমি ক্যাম্প কমান্ডারকে বলেছিলাম যে, আপনারা তো জেনেভা কনভেনশন ভঙ্গ করছেন। সে আমাকে জবাব দিল:

> ❝ কনভেনশনের কথা ভুলে যাও, কোনো অধিকার নেই তোমাদের। [১২৮]

কয়েকদিনের মাঝেই দেখলাম সুস্থ-সবল যারা ঢুকেছিল, লাশ হয়ে বেরোচ্ছে। ট্রাকে ভরে লাশগুলো নিয়ে যেতো। ১৭ বছরের এক ছেলে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে নিজের গ্রামের দিকে চেয়ে কাঁদত, একদম কাছে তার গাঁ, চোখে দেখা যেত। এক সকালে দেখি তার গুলিবিদ্ধ দেহ বেড়ার গোড়ায় পড়ে আছে। গার্ডরা লাশটা বেড়ার গায়ে ঝুলিয়ে রাখল সতর্কবাণী হিসেবে, যাতে আর কেউ পালাবার চিন্তাও না করে।

[তুলনীয়: কনভেনশন নীতি: পালানোর চেষ্টা কোনো অপরাধ বিবেচিত হবে না। শাস্তি হিসেবে শুধু নজরদারি বাড়ানো হবে, কোনো সুবিধা হরণ করা যাবে না]

সিপাহী Heinz-কে আমেরিকান সেনারা হাসপাতাল থেকে ধরে নিয়ে আসে Bad Kreuznach ক্যাম্পে। সেখানে লক্ষাধিক বন্দী ছিল with no roof, almost no food, little water, no mail... শীত থেকে বাঁচতে গর্ত খোঁড়া বা আগুন জ্বালানোর অনুমতি ছিল না। খাবার বলতে সহজলভ্য ছিল ঘাস। কেবল জার্মান সেনারাই না; ৬ বছরের শিশু, ৬০ বছরের বৃদ্ধ, গর্ভবতী নারী। ফরাসিদের এক রিপোর্টে এসেছে রেজিস্টার্ড হয়েছে, আমেরিকা ১ লাখ লোক হস্তান্তর করেছে ফরাসিদের কাছে, তার মধ্যে ৩২৬৪০ জন নারী-শিশু-বৃদ্ধ।

আরেক বন্দি George Weiss জানিয়েছেন: এত গাদাগাদি, পা মেলে শুতে পারতাম না। সারে ৩ দিন অব্দি এক ফোঁটা পানি মেলেনি, নিজের পেশাব খেয়েছি আমরা। কেউ মাটি চেটেছে পিপাসায়। অথচ কাঁটাতারের ওপাশেই রাইন নদী।

Reinberg ক্যাম্পে বন্দি Wolfgang Iff-এর সেকশনে ছিল ১০ হাজার বন্দি। তার দেখা, প্রতিদিন ৩০-৪০ জনের লাশ বের হতো। কোনো কোনোদিন ২০০ জন পর্যন্ত উঠত।

অথচ সে সময় খাদ্যের অপ্রতুলতা ছিল না। আমেরিকা চাইলে এই লক্ষ লক্ষ বন্দিকে খাওয়াতে পারত। এপ্রিলের রিপোর্টে ছিল: ‘ইউরোপে এই পরিমাণ খাবার আছে আমাদের হাতে যে, ৫০ লাখ লোককে দিনে ৪০০০ ক্যালরি করে খাওয়াতে পারব’। অথচ ইচ্ছে করে এদের খেতে দেওয়া হয়নি। ২৩ মে কোয়ার্টার মাস্টার

---

[১২৮] ibid, p38

মেজর জেনারেল লিটলজন তার বন্ধু সহকারী চীফ অফ স্টাফ Bob Crawford-কে জানিয়েছেন: 'আমি জানি যে আমার পক্ষে ৩০ লাখ বন্দিকে খাওয়ানো সম্ভব না। আমার চাহিদাপত্র বার বার যুদ্ধদপ্তর প্রত্যাখ্যান করছে'।

৩. যুদ্ধবন্দিদের হত্যা

১৯২৯ সালে ৩য় জেনেভা কনভেনশানে (Convention relative to the Treatment of Prisoners of War, Geneva July 27, 1929) সোভিয়েত ও জাপান সম্মতি দিয়েছিল, কিন্তু অফিসিয়ালি সই করেনি। ২য় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই কনভেনশন চলছিল। কে কার কত যুদ্ধবন্দির কত পার্সেন্ট হত্যা করেছে [১২৯] নিচের চার্টটা থেকে ধারণা পাওয়া যায়। এরাই চুক্তি করে, এরাই সম্মতি-সই দেয়, এরাই ভাঙে। আর আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ডের মিসকিনরা মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকি: আহা, এরা কত সভ্য, কত আধুনিক।

কাদের সেনা	মোট বন্দির কত পার্সেন্ট মেরেছে	কারা মেরেছে	সংখ্যাটা কত
মিত্রশক্তির হাতে নিহত			
জার্মান সেনা	৩২.৯%	পূর্ব ইউরোপ	
জার্মান সেনা	৩৫.৮%	সোভিয়েত	৩,৬৩,০০০ মরে গেছে কনফার্ম করেছে Deutsche Dienststelle (WASt) [১৩০]। সোভিয়েত হেফাজতে থাকা ৭ লাখ সেনা নিখোঁজ। মোট ১০ লাখ। [১৩১]
ইতালীয় সেনা	৭৯%	সোভিয়েত	
জার্মান সেনা	০.০৩%	বৃটেন	ভাইয়ারা ভালো
জার্মান সেনা	০.১৫%	আমেরিকা	
জার্মান সেনা	২.৫৮%	ফ্রান্স	

[১২৯] Ferguson, Niall (2004). "Prisoner Taking and Prisoner Killing in the Age of Total War: Towards a Political Economy of Military Defeat". War in History. 11 (2): 148–92

[১৩০] German government agency based in Berlin which maintains records of members of the former German Wehrmacht who were killed in action, as well as official military records of all military personnel during World War II

[১৩১] Rüdiger Overmans. Deutsche militärische Verluste im Zweiten Weltkrieg. (German military losses in World War II) Oldenbourg 2000.Page 286-289

অক্ষশক্তির হাতে নিহত			
মার্কিন-বৃটিশ সেনা	৪%	জার্মানি	
সোভিয়েত সেনা	৫৭.৫%	জার্মানি	
ইতালীয় সেনা	৬- ৮.৪%	জার্মানি	ইতালি আত্মসমর্পণ করে মিত্রপক্ষে যাবার পর
মিত্র সেনা	২৭%	জাপান	১০-১৯ হাজার

সোভিয়েত আর জাপান সইসাবুদ করেনি বুঝলাম। আর জার্মানি তো জংলী, অসভ্য। কিন্তু আমেরিকা? আর সব দেশের অসভ্যতা মেনে নেওয়া যায়, আমেরিকারটা কীভাবে মানবেন? অনেকে বলবেন, এসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা যুদ্ধের মাঠে হয়েই থাকে।

- যুদ্ধের পর ৩২৮ তম ইউএস পদাতিক রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টারের একটি লিখিত আদেশ উদ্ধার হয়: কোনো জার্মান সেনাকে বন্দি হিসেবে নেবে না, দেখামাত্র গুলি।

- মেজর জেনারেল Raymond Hufft এর নির্দেশ ছিল, রাইন নদী পার হবার পর আর কাউকে বন্দি করবে না (সব ভোগে চলে যাবে)। ঐতিহাসিক Stephen Ambrose বলেন, এনাকে যখন জিগ্যেস করা হলো এইসব আদেশের ব্যাপারে, তিনি বললেন: ‘জার্মানরা জিতলে আজ আমার বিচার করতো ন্যুরেমবার্গে নিয়ে’।[১৩২] হয়ে গেল জাস্টিফিকেশন।

- ঐতিহাসিক Peter Lieb-এর রিসার্চে এসেছে, বহু আমেরিকান ও কানাডীয় ইউনিটকে বলাই ছিল: D-Day তে নরম্যান্ডিতে নামার পর কাউকে বন্দি যেন না করা হয় (কুল্লু খালাছ)। [১৩৩]

- Biscari গণহত্যার বিচারে সার্জেন্ট West (যিনি ৭৫ জনের মাঝে ৩৭ জনাকে একাই হত্যা করেন) কারণ হিসেবে বলেছেন: ওপরের অর্ডার মেনেছি। জেনারেল Paton তাঁর ব্রিফিং স্পীচে বলেছেন:

> “ যখন আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে নামবো, তাকে আঘাত করতে ভুলো না, জোরে আঘাত কোরো। আমরা তাকে হত্যা করবো, কোনো দয়ামায়া নয়। সে তোমাদের

[১৩২] Bradley A. Thayer, Darwin and international relations p.186 p.189 p.180
[১৩৩] The Horror of D-Day: A New Openness to Discussing Allied War Crimes in WWII, Spiegel Online, 05/04/2010, (part 1- Part 2).

হাজারো সাথি হত্যা করেছে। মরতে তাকে হবেই।[১৩৪]

বিচ্ছিন্ন ঘটনা তো যুদ্ধে হয়েই থাকে। তাহলে এই সুপ্রীম কমান্ডগুলোকেও কি বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলা যাবে?

সামনে আমরা জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯ দেখবো। এসব আলোচনা এজন্য করছি, যাতে যুদ্ধকালীন সাইকোলজিটা আমরা বুঝতে পারি। কাউকে আমরা দায়ী করছি না। **যুদ্ধের সময় স্বাভাবিক মানবীয় সুকুমারবৃত্তিগুলো কাজ করে না। এখন এই মুহূর্তে আপনি যা ভাবছেন, যেভাবে একটা বিষয়কে দেখছেন, শত্রুর মুখোমুখি ব্যাপারগুলো এমন থাকে না।** যত কনভেনশনই আপনি তৈরি করেন, যত কাগুজে নিয়মই আপনি বানান। দেখুন, **যারা কনভেনশন বানিয়েছে, তারাই মানতে পারেনি, আইন বানিয়ে ভেঙেছে (আমেরিকা), যোগসাজশ করে চুক্তি করে ভেঙেছে (ইয়াল্টা চুক্তি), যারা ভাঙতে চায়নি, তারা দায় এড়িয়েছে (বৃটেন)। কেননা এই কাগুজে চুক্তি শুনতে শোনা যায় ভালো, কিন্তু মানব প্রবৃত্তির বিপরীত। যুদ্ধকালে মানুষের মন এভাবে কাজ করে না।**

[১৩৪] George Ducan's, Massacres and Atrocities of World War II.

জেনেভা কনভেনশন ১৯৪৯

পাঠক, আমরা দেখলাম ৩য় জেনেভা কনভেনশনের এসব কাগজীয় নীতিমালা কী প্রচণ্ডভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে ২য় বিশ্বযুদ্ধে। ফলে যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে নতুন করে ৪টি কনভেনশন (সমঝোতা) যোগ করা হয়—

১. ময়দানের অসুস্থ ও আহত সেনাদের উন্নয়ন;
২. সমুদ্রে আহত-অসুস্থ-জাহাজডুবি হওয়া সেনাদের উন্নয়ন;
৩. যুদ্ধবন্দিদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত;
৪. যুদ্ধকালীন বেসামরিক লোকের সুরক্ষা সম্পর্কিত।

১৮০টি দেশ এতে স্বাক্ষর করে। কিন্তু ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী দশকগুলোতে উপনিবেশের স্বাধীনতাযুদ্ধগুলোতে এই কাগুজে বাঘ আবারও অকর্মণ্য সাব্যস্ত হয়। কোরিয়া যুদ্ধ (১৯৫০-১৯৫৩), ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-১৯৭৫) ও আরব-ইসরাইল যুদ্ধে (১৯৪৮, ১৯৬৭, ১৯৭৩) প্রস্তাবকরা বা প্রস্তাবকদের সমর্থিত পক্ষ নিজেরাই এর চরম লঙ্ঘন করে। ফলে ১৯৭৭ সালে আরও দুটো ধারা যুক্ত করা হয় যুদ্ধাপরাধীকে বিচারের আওতায় আনার ব্যাপারে।[১৩৫]

বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ নেই। আমরা শুধু দেখব কারা কারা ভেঙেছে, কী কৌশল করে ভেঙেছে। আর সেই লঙ্ঘন সম্পর্কিত বিধিটা একটু দেখে নেব। স্ট্যালিন, মাওসেতুং-সহ সমাজতন্ত্রীরা নিজ দেশের জনগণই মেরেছে মিলিয়ন মিলিয়ন। তাদের কাছে সভ্যতা কিছুই আশা করে না। কিন্তু যারা মানবতার বুলি কপচায়, তাদের কীর্তিকলাপ কী ছিল— দেখলেই বুঝা যাবে এইসব কাগজের গুরুত্ব মাঠে কতোখানি।

---

[১৩৫] Malcolm Shaw (March 04, 2020). Geneva Conventions 1864–1977. Encyclopedia Britannica [Sir Robert Jennings Professor of International Law, University of Leicester, England]